পর্বতের বক্ষে

অনেকের মনেই একটা ভবঘুরে পথিক লুকিয়ে থাকে। আমার মনেও সেইরকম এক ভাবনা লুকিয়ে আছে। আমার ভবঘুরে মনের সব ইচ্ছেগুলোকে পূরণ করেছেন আমার মা ও বাবা। তাঁরা আমায় ভারতবর্ষের অনেক সুন্দর জায়গা ঘুরিয়েছেন। আমি সত্যিই তাঁদের কাছে আমার মন থেকে কৃতজ্ঞ।

প্রত্যেক বছরই আমরা কোথাও না কোথাও ঘুরতে যাই, গত বছরও গিয়েছিলাম। যেখানে গিয়েছিলাম, সেখানে অনেক মানুষই তাদের জীবনে একবারও যান নি; এমনকি অনেকে সেই জায়গার কখনও নামও শোনেন নি। সেই অপূর্ব জায়গাটির নাম হল হরশিল। সেই জায়গাটি গঙ্গোত্রি থেকে প্রায় ২৫ কি.মি. নীচে এবং তার উচ্চতা হল প্রায় ৯০০০ ফিট। সেই জায়গায় পৌঁছোনর জন্য আমাদের অনেক দুর্গম পাহাড়ি রাস্তা দিয়ে যেতে হয়েছে। আমাদের প্রথম যেতে হয়েছে হরিদ্বার। তারপর সেখান থেকে প্রায় আট ঘন্টা গাড়ি করে উত্তরকাশী। সেইখানে পৌঁছনোর পর আমাদের একদিন থাকতে হল কারণ সেখান থেকে হরশিল দিনে মাত্র দু'টো গাড়ি যায় এবং দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের পৌঁছনোর আগেই গাড়ি দুটো বেরিয়ে পড়েছিল। পরদিন ভোরবেলায় হরশিল যাওয়ার জন্য আমরা রওনা দিলাম।

তিন ঘন্টায় আমাদের গন্তব্যে আমরা পৌঁছে গেলাম! সত্যি, জায়গাটির কোন তুলনা নেই! হিমালয়ের সঙ্গে গঙ্গার সহাবস্থানে এক অসাধারণ সৌন্দর্যের সৃষ্টি হয়েছে, মনে হচ্ছিল যেন আমরা স্বর্গে বসে আছি! কিন্তু, কোন মানুষ না যাওয়ার জন্য সেখানে থাকার কোন ভালো জায়গা ছিল না। শুধু একটা সরকারী লজ ছিল যেটা বাকিদের থেকে একটু ভালো। সেখানেই আমরা ঘর ভাড়া নিলাম। লজের লোকেরা আমাদের সেখানে ওই ঠান্ডায় দেখে প্রচন্ড অবাক হয়ে গেল কারণ পর্যটকরা সেখানে খুবই অল্প যায় এবং শীতকালে তো কেউই যায় না। আমরা সেখানে ডিসেম্বরের শীতে গিয়েছিলাম! ঘরের ভেতর তো থাকাই যাচ্ছিল না কারন লো ভোল্টেজের জন্য রুম হিটারটা গরমই হচ্ছিল না। তাই, ঘরের ভেতর বেশি ঠান্ডা লাগবে ভেবে আমরা তখন ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লাম। বাইরে বেরিয়ে আমরা রাস্তা দিয়ে হাঁটতে শুরু করলাম। সেখানকার স্থানীয় লোকেদের কাছ থেকে জানতে পারলাম যে সেখানে পনেরো থেকে বিশের বেশি বাড়ি নেই। হরশিল গরে উঠেছে শুধু একটা মিলিটারি ক্যাম্পকে ঘিরে। ভারত-তিব্বত সীমান্তরক্ষীদের এই ক্যাম্প, যাদের কাজ হল সারা বছর আমাদের এই সীমান্ত রক্ষা করা। সেই ক্যাম্পের জন্য যে সব খাবার আসে, সেখান থেকেই কিছু খাবার স্থানীয় লোকেদের দেওয়া হয়। রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আমি একটা জিনিস অনুভব করলাম যে

ঈশ্বরের যা কিছু সৃষ্টি আছে, তারা কেউ কারুর জন্য অপেক্ষা করে না; যেমন, আমরা দেখি বা না দেখি, সমুদ্রের ঢেউ আমাদের জন্য অপেক্ষা করে না, সে নিজের মতো ভেসে চলে। তেমনি, আমরা লক্ষ্য করি বা না করি, পাহাড়ের সৌন্দর্য কখনও আমাদের না দেখার জন্য কমে যায় না, সে নিজের মতই রয়ে যায়। হরশিলের সেই অপূর্ব দৃশ্য দেখে, সে পাহাড়গুলোর সঙ্গে আমার মনে এক অদ্ভুত বন্ধন তৈরি হল! সেই বড়ফে ঢাকা পাহাড়, অতুলনীয় পাহাড়ি গাছের সৌন্দর্য, এইসব মিলিয়ে যে এক অপূর্ব আবহাওয়ার সৃষ্টি করেছে, সেই সৌন্দর্য দেখে আমার মন ভরে গেল। আমি তখনই ভগবানের কাছে প্রার্থনা করলাম যে পৃথিবীর এই অতুলনীয় সৌন্দর্যকে যেন তিনি সবসময়ই জীবিত রাখেন।

সোহম বনিক

অষ্টম শ্রেণী

অনন্য ত্রিপুরা

আয়তনে ভারতের চতুর্থ ক্ষুদ্রতম রাজ্য ত্রিপুরা। মূলত বিয়াং, জামাতি, চাকমা, হালাম, লুথাই ওমস উপজাতির দেশ। এদের সমাজ, সংস্কৃতি ভিন্ন ভিন্ন। নাচে আর গানে উৎসবমুখর এরা। এদের বসতি শহর ছাড়িয়ে দূর দূরান্তের পাহাড়ের ঢালে ঢালে। পাহাড়, অরণ্য, দিঘি, প্রাচীন মন্দিরে ও প্রাকৃতিক দৃশ্যে ভরপুর সবুজ ত্রিপুরা। চারটি ওয়াইল্ডলাইফ স্যাঙ্কচুয়ারি আছে এখানে। ধান এদের মুখ্য ফসল। নানান বর্নের ফ্যাব্রিক শাড়ী, শীতলপাটি ও বাঁশ ও কাঠের নানান সম্ভার আকর্ষণীয়। ত্রিপুরার অতীত ইতিহাসের কথা মহাভারতে বর্ণিত আছে। কারো মতে পৌরাণিক রাজা চন্দ্রবংশীয় যযাতির পুত্র দ্রুহ্যকিরাত দেশ থেকে বিতারিত হয়ে রাজ্য গড়েন সেকালের ত্রিপুরায়। আর দ্রুহ্যর ৪০ তম উত্তরসূরি মহারাজ ত্রিপুরের নাম থেকেই 'ত্রিপুরা' রাজ্যের সূচনা বলে অনেকে মনে করেন। ত্রিপুরা ভ্রমনে সবচেয়ে সুবিধাজনক উড়োজাহাজে বাংলাদেশের উপর দিয়ে দমদম বিমানবন্দর থেকে আগড়তলা পৌঁছে যাওয়া যায় মাত্র ৪৫ মিনিটের ব্যবধানে।

শহরের প্রাণকেন্দ্রে রয়েছে উজ্জয়ন্ত প্রাসাদ। এটি ১৮৯৭-এ বিধ্বংসী ভূমিকম্পে ধ্বংস হয়ে যায়। ১৯০৯ সালে মহারাজা রাধাকিশোর মানিক্য বাহাদুর ১০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এটি পুনর্নির্মাণ করেন। শহর থেকে ৩ কিলোমিটার দূরে আছে মহারাজা বীরবিক্রম কলেজ। স্থাপত্য ও ভাষ্কর্যে এটি অসাধারণ। শহরের আসপাশে ছড়িয়ে আছে চতুর্দশ দেবতাবাড়ি, বেনুবনবিহার ও আগরতলা মিউজিয়াম। শহর থেকে ৩৫ কিলোমিটার দূরে আছে সিপাহীজলা অভয়ারণ্য। এখানে তক্ষক, উল্লুক, ভল্লুক, নেউল, নীলগাই ও অন্যান্য জন্তু ছাড়াও আছে বিরল চশমা বাদর। মাতাবাড়ির কাছে উদয়পুর শহরে আছে বিখ্যাত ত্রিপুরাসুন্দরী মন্দির। বাংলাদেশ লাগোয়া সীমান্ত শহর সোনামুড়ার কাছেই আছে সুবিখ্যাত রুদ্রসাগর লেক তথা নীরমহল। বিশিষ্ট স্থপতি মার্টিন এন্ড বার্ন ১৯৩০ সালে শুরু করে মাত্র ন'বছরে এই ভাসমান প্রাসাদ তৈরি করেন। মহারাজা

বীর বিক্রমকিশোর মানিক্য বাহাদুর এটি তৈরি করেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এটির নামকরণ করেন। পর্যটকদের কাছে ডম্বুর ফলস আর প্রস্তরস্ত ভান্ডার পিলক ওযমান আকর্ষণীয়। বাংলাদেশ স্টেশন সংলগ্ন সীমান্তে রয়েছে কসবা কালীবাড়ি। সেখানে সন্ধ্যারতি ও প্রসাদ অতুলনীয়। দক্ষীণ ত্রিপুরায় রয়েছে বিখ্যাত কৃষ্ণা ওয়াইল্ডলাইফ স্যাঙ্কচুয়ারি। সেখানে চশমা বাদর, সোনালী বাদর, লজ্জাবতী বানর, গুহা বানর-এর বিচিত্র এক সমাবেশ রয়েছে। কৈলাসহরের অনতিদূরে রয়েছে আকর্ষণীয় ঊনকোটি তীর্থস্থান। কোটি থেকে এক কম বলে এই নাম। বৌদ্ধ ও হিন্দু আমলের অরণ্যময় এই তীর্থে পুরো পাহাড়টাই ভাস্কর্যময়।

আগরতলা থেকে ২৫০ কিলোমিটার দূরে ৩০০০ ফুট উঁচুতে চিরবসন্তের দেশ জম্পুই হিলস। ছ'টি পাহাড় নিয়ে জম্পুই। খ্রীষ্টানধর্মাবিলম্বি লমাই উপজাতির বাস এখানে। মনোহর প্রকৃতি, রং-বেরং-এর অর্কিড, অবিরাম ঘন্টাপোকার ঘন্টার আওয়াজ জম্পুই হিলসকে প্রাণবন্ত করে তুলেছে। পাহাড়ি ঢালে গাছে ধরে আছে রসে টসটসে কমলা। এখানে সপ্তাহে একদিন হাট বসে। প্রাণবন্ত এই হাটে পাওয়া যায় প্রায় সবকিছুই। দিনান্তে পসরা নিয়ে বাড়ি ফেরে লুসাই মেয়েরা। একপাশে আইজলে (মিজোরামের রাজধানী) এর দৃশ্য দেখা যাচ্ছে। সোনালী আলোয় চিকচিক করছে তাদের টিনের ছোট্ট ছোট্ট ঘরগুলি।

সুন্দরী জম্পুইকে বিদায় জানিয়ে ঘরে ফেরা। অনেক অনে স্মৃতি বুকে নিয়ে যা সারাজীবন মনের মনিকোঠায় শায়িত থাকবে। বারবার তাই বলতে হয়, অনন্য ত্রিপুরা, সুন্দরী ত্রিপুরা, প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক সম্পদে পরিপুর্ণ ধন্য তুমি ত্রিপুরা!

নীলেশ বড়ুয়া

সপ্তম শ্রেনী